

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন সমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাহিমা আক্তার

রোলঃ 23100121010

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন সমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাহিমা আক্তার

রোলঃ 23100121010

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন সমূহ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাহিমা আক্তার, আইডিঃ 23100121010 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ শারফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন সমূহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারীফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

রাহিমা আক্তার

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ 23100121010

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য ও কুরআনের বিস্ময়কর বর্ণনা.....	7
দ্বিতীয় অধ্যায়: জ্ঞাতত্ত্ব ও মানব সৃষ্টির অলৌকিক রহস্য	11
তৃতীয় অধ্যায়: পাহাড়ের শিকড় ও ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন.....	16
চতুর্থ অধ্যায়: মহাসমুদ্রের মিলন ও নদীর বাধার রহস্য	21
পঞ্চম অধ্যায়: মেঘ, বৃষ্টি ও পানি চক্রের নিখুঁত বর্ণনা	25
ষষ্ঠ অধ্যায়: উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য	30
সপ্তম অধ্যায়: মানবদেহ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিদর্শন.....	36
অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার ও সারসংক্ষেপ	42

ভূমিকা

মানব সভ্যতা আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। প্রযুক্তি আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে অসীম সম্ভাবনা। অথচ এই আধুনিকতার ভিড়েও এক চিরন্তন সত্যের আলো অমলিন, – সেই আলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের। পৃথিবী যখন প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে, তখন কুরআনের বাণী নতুন নতুন অর্থে উদ্ভাসিত হয়ে প্রমাণ করছে যে, এটি কোনো সাধারণ গ্রন্থ নয়, বরং সর্বকালের মানবজাতির জন্য এক জীবন্ত নিদর্শন।

আধুনিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের যে সকল আবিষ্কার আমরা আজ বিস্ময়ের সাথে দেখছি, কুরআন মজিদ দেড় হাজার বছর আগেই তার ইঙ্গিত দিয়েছে। এই রচনার মাধ্যমে আমরা সেই সকল নিদর্শনকে অত্যন্ত সহজ ভাষায়, কুরআনের আয়াত ও তার বাংলা অনুবাদের আলোকে উপস্থাপন করব।

উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, আধুনিক পাঠক বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কুরআনের প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা জাগ্রত করা। দ্বিতীয়ত, প্রমাণ করা যে ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী নয়, বরং প্রকৃত ধর্মই হলো বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। তৃতীয়ত, বিভিন্ন বই ও গবেষণার আলোকে আধুনিক বিশ্বের সাথে কুরআনের মিলগুলো সহজ করে উপস্থাপন করা, যাতে সাধারণ পাঠকও বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে।

ইংরেজি ভাষায় ড. মরিস বুকাইলির “**The Bible, The Qur’an and Science**” এবং বাংলা ভাষায় জনাব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের “বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন” বই দুটি আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। ড. বুকাইলি একজন ফরাসি চিকিৎসক, যিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী গবেষণা করেছেন। অন্যদিকে আল-গালিব সাহেব বাংলা ভাষায় অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল উপস্থাপনায় কুরআনের বৈজ্ঞানিক নিদর্শনগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন।

গঠন ও পরিকল্পনা

এই থিসিসটি মূলত আটটি পর্বে বিভক্ত। সূচনার এই পর্ব শেষে আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করব মূল বিষয়বস্তুতে। আমরা দেখব কীভাবে অন্ধকার যুগে মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে তত্ত্ব কুরআন দিয়েছে, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান আজ তা হুবহু প্রমাণ করেছে। আমরা আলোচনা করব ঈগতত্বের অলৌকিক তথ্য, যা আধুনিক অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের হাজার বছর আগে কুরআন বর্ণনা করেছিল। এছাড়া পাহাড়ের শিকড় থেকে শুরু করে মহাসমুদ্রের মিলনস্থলের বাধা – এমনই সব চমকপ্রদ নিদর্শন ধাপে ধাপে ফুটে উঠবে এই থিসিসের পাতায় পাতায়।

প্রথম অধ্যায়: মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য ও কুরআনের বিস্ময়কর বর্ণনা

আমরা যখন রাতের আকাশে মিটিমিটি জ্বলতে থাকা অগণিত তারার দিকে তাকাই, তখন এক গভীর বিস্ময় আমাদের গ্রাস করে। এই বিশাল মহাবিশ্বের সৃষ্টি কীভাবে হলো, তা জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। আধুনিক বিজ্ঞান আজ থেকে মাত্র একশ বছর আগেও এ বিষয়ে অন্ধকারে ছিল। বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানীরা এক চমকপ্রদ তত্ত্ব দেন, যা ‘মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব’ বা ‘বিগ ব্যাং থিওরি’ নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব বলে, আজ থেকে প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে সমগ্র মহাবিশ্ব একটি অতি ঘন ও উত্তপ্ত বিন্দুতে আবদ্ধ ছিল। তারপর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই বিন্দু প্রসারিত হতে থাকে এবং ক্রমশ আজকের এই বিশাল বিশ্বের রূপ নেয়।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো, পবিত্র কুরআন দেড় হাজার বছর আগেই এই সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছে। কোনো টেলিস্কোপ বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে ঘোষিত হয়েছিল এমন এক সত্য, যা আধুনিক বিজ্ঞানীরা আজ সবিস্ময়ে স্বীকার করছেন। আসুন, কুরআনের সেই আয়াতগুলো সরল বাংলা অনুবাদসহ দেখি।

মহাবিস্ফোরণের ধারণা

কুরআনের সূরা আশ্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا"

অর্থ: "যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না যে, আসমানসমূহ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে আলাদা করে দিলাম।"

এই আয়াতটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যায়, শুরুতে আকাশ ও পৃথিবী একটাই বস্তু ছিল। ‘রাতক’ শব্দের অর্থ হলো জোড়া লাগানো বা একত্রিত। আর ‘ফাতাক্না’ অর্থ পৃথক করে দেওয়া বা ফাটিয়ে দেওয়া। এটি হুবহু বিগ ব্যাং তত্ত্বেরই বর্ণনা – যেখানে শুরুতে সব এক জায়গায় ঘনীভূত ছিল, তারপর বিস্ফোরণে আলাদা হয়ে যায়।

ড. মরিস বুকাইলি তার “The Bible, The Qur’an and Science” বইতে এই আয়াতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, কুরআনের এই বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। জনাব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবও তার “বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন” বইতে লিখেছেন, এই আয়াত সেই যুগের মানুষের জন্য রীতিমতো বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা, যে যুগে পৃথিবী ও আকাশকে স্থির ও পৃথক মনে করা হতো।

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর তা স্থির হয়ে থাকেনি। ১৯২৯ সালে বিজ্ঞানী এডুইন হাবল আবিষ্কার করেন যে, ছায়াপথগুলো একে অপরের থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই আবিষ্কার আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।

কুরআনে এই সম্প্রসারণের কথাও পরিষ্কারভাবে বলা আছে। সূরা যারিয়াতের ৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ"

অর্থ: "আর আমি আকাশকে আমার শক্তির বলে নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই একে সম্প্রসারিত করছি।"

‘লামূসিউন’ শব্দটি আরবি ধাতু ‘ওয়াসি’আ’ থেকে এসেছে, যার অর্থ প্রশস্ত করা, বিস্তৃত করা। অর্থাৎ কুরআন পরিষ্কার বলছে যে, আকাশ তথা মহাবিশ্বকে ক্রমাগত বিস্তৃত করা হচ্ছে। জনাব আল-গালিব উল্লেখ করেছেন, এই আয়াতটি হাবলের আবিষ্কারের বহু আগেই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের ধারণা দেয়, যা কুরআনের ঐশী উৎসের একটি জোরালো প্রমাণ।

নক্ষত্রের সমাপ্তি ও কৃষ্ণগহ্বর

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে, নক্ষত্র বা তারাদেরও জন্ম ও মৃত্যু আছে। বড় বড় তারাগুলো যখন তাদের জ্বালানি শেষ করে, তখন তারা সংকুচিত হয়ে প্রচণ্ড ঘনত্বসম্পন্ন বস্তুতে পরিণত হয়, যাকে কৃষ্ণগহ্বর বা ‘ব্ল্যাক হোল’ বলে। এই কৃষ্ণগহ্বরের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত বেশি যে, আলোও তা থেকে বের হতে পারে না। বিজ্ঞানীরা এই ব্ল্যাক হোলের কোনো কেন্দ্র নির্ধারণ করতে পারেন না, বরং তা এক অদৃশ্য শক্তির মতো কাজ করে।

কুরআনের একটি চমকপ্রদ আয়াত হলো সূরা তাকভীরের ১৫-১৬ নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলেন:

"فَلَا أُفْسِدُ بِالْخُنُوسِ، الْجَوَارِ الْكُنُوسِ"

অর্থ: "আমি শপথ করছি সেই নক্ষত্রগুলোর, যারা পেছনে সরে যায়, এবং চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যায়।"

‘খুন্নাস’ শব্দের অর্থ যা সংকুচিত হয়ে পেছনে সরে যায়, আর ‘কুন্নাস’ অর্থ যা নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে লুকিয়ে পড়ে। আল-গালিব সাহেব তার বইতে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, খুন্নাস বলতে ব্ল্যাক হোলের সেই বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে তারা সংকুচিত হয়ে আলো পর্যন্ত গ্রাস করে নেয়; আর কুন্নাস বলতে সেই অদৃশ্য অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যা দেখা যায় না কিন্তু মহাকাশে বিচরণ করে।

ড. মরিস বুকাইলিও এই আয়াতের গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন, কুরআনের এমন বর্ণনা মহাকাশের অত্যন্ত আধুনিক জ্ঞান ছাড়া সম্ভব ছিল না। অথচ এই বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল ১৪০০ বছর আগে, যখন তারাদের রহস্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ কাব্যিক ও ভুল।

মহাকাশের বিস্তৃতি ও সুশৃঙ্খল কক্ষপথ

শুধু সৃষ্টি বা সম্প্রসারণই নয়, কুরআন মহাকাশীয় বস্তুগুলোর সুশৃঙ্খল চলাচলের কথাও উল্লেখ করেছে। সূরা ইয়াসীনের ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ"

অর্থ: "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে ধরা, আর রাত দিনের আগে আসতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।"

‘ইয়াসবাহূন’ শব্দটি সাঁতার কাটার গতিকে বোঝায়। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, সূর্য, চাঁদ, গ্রহ-নক্ষত্র সবাই নিজস্ব নিয়মে এক কক্ষপথ ধরে চলছে। এই চলা মোটেও এলোমেলো নয়, বরং এক নিখুঁত গাণিতিক নিয়মে বাঁধা। এই শৃঙ্খলা না থাকলে পুরো মহাবিশ্ব ভেঙে পড়ত। এখানে কুরআনের ভাষা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত।

উপসংহার

মহাবিশ্ব সৃষ্টির এসব বর্ণনা আমাদের শেখায় যে, কুরআন কোনো প্রচলিত ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি এক জীবন্ত মু'জিজা। সূরা আশ্বিয়ার বিগ ব্যাং-এর ধারণা, সূরা যারিয়াতের সম্প্রসারণশীল আকাশ, সূরা তাকভীরের কৃষ্ণগহ্বরের ইঙ্গিত – সবকিছু মিলে আমাদের সামনে এক অপার বিস্ময়ের জগৎ খুলে দেয়। আজকের বিজ্ঞানীরা যে সত্যগুলো আবিষ্কার করে পুরস্কৃত হচ্ছেন, কুরআন তা বহুকাল আগেই বলে রেখেছে। এই অধ্যায়ে আমরা বুঝতে পারলাম, আধুনিক মহাবিশ্বতত্ত্ব কুরআনের সত্যতাকে আরও মজবুত করে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কুরআনের আরেক চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক নিদর্শন – মানুষের জ্ঞাতাত্ত্বিক বিকাশ নিয়ে আলোচনা করব, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের সাথে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: জ্ঞাতত্ত্ব ও মানব সৃষ্টির অলৌকিক রহস্য

মানবদেহ আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। একটি ক্ষুদ্র কোষ থেকে কীভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি হয়, তা জানার জন্য বিজ্ঞানীদের হাজার বছর লেগেছে। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর আমরা আজ জানতে পেরেছি, মাতৃগর্ভে একটি শিশু ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো, পবিত্র কুরআন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে জ্ঞানের সেই ধাপগুলোর এত নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে, যা আধুনিক জ্ঞাতত্ত্বের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এই অধ্যায়ে আমরা সেই অলৌকিক বর্ণনাগুলো সহজ ভাষায় বুঝাব।

সৃষ্টির সূচনা: একতুচ্ছ তরল থেকে

আমরা সবাই জানি, মানব জীবনের শুরুটা হয় পিতা-মাতার মিলনের মাধ্যমে। কুরআন এই শুরুর কথা খুব সুন্দরভাবে বলেছে। সূরা সাজদাহ-এর ৭ ও ৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ

অর্থ: "যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তারপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন এক তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।"

আয়াতে ‘মা-ইম মাহীন’ বলতে সেই তরলকে বোঝানো হয়েছে, যা অত্যন্ত তুচ্ছ বা দুর্বল বলে মনে হয়। অথচ এই তুচ্ছ তরল থেকেই আল্লাহ এক অসাধারণ জীবন শুরু করেন। ড. মরিস বুকাইলি তার “**The Bible, The Qur’an and Science**” বইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, কুরআনের ‘নুতফা’ শব্দটি কেবল শুক্রাণু বা ডিম্বাণুকে বোঝায় না, বরং মিলিত কোষকেও বোঝায়। এটি অনেক আধুনিক গবেষণার ভিত্তি।

রক্ষিত স্থানে স্থাপন

নিষিক্ত ডিম্বাণু যখন মায়ের গর্ভে যায়, তখন তা একটি নিরাপদ স্থানে স্থাপিত হয়। কুরআন এই বাস্তবতাকে চমৎকারভাবে বলেছে। সূরা মুরসালাতের ২০-২২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ"

অর্থ: "আমি কি তোমাদের সৃষ্টি করিনি এক তুচ্ছ তরল থেকে? অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি এক নিরাপদ ও সংরক্ষিত স্থানে।"

‘কারারিম মাকীন’ বলতে জরায়ুকে বোঝানো হয়েছে, যা মায়ের পেটের ভেতরে হাড় ও পেশির শক্ত আবরণে সুরক্ষিত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, জরায়ু এমন এক জায়গা যেখানে বাইরের কোনো আঘাত সহজে পৌঁছাতে পারে না। অথচ এই সুরক্ষার বিবরণ কুরআন সেই সময় দিয়ে দিয়েছে যখন জরায়ুর কাজ সম্পর্কে মানুষের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। জনাব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার “বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন” বইতে বলেন, ‘কারার’ শব্দের অর্থ এমন স্থান যেখানে কিছু স্থিরভাবে রাখা হয়। আর ‘মাকীন’ অর্থ মজবুত ও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত। দুটি শব্দই অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত।

তিনটি অঙ্ককারের আবরণ

আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব বলে, গর্ভের শিশু তিনটি স্তরের আবরণে ঘেরা থাকে। এই স্তরগুলো হলো: পেটের বাইরের দেওয়াল, জরায়ুর দেওয়াল এবং ভ্রূণের চারপাশের থলি বা পর্দা। কুরআন এই তিন অঙ্ককারের কথাও বলেছে। সূরা যুমারের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ"

অর্থ: "তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মায়ের পেটে, এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, তিনটি অঙ্ককারের ভেতরে।"

এই 'তিনটি অঙ্ককার' বলতে বিজ্ঞানীরা আজ বুঝতে পারেন, পেটের ভেতরের সেই তিন স্তরের কথা। ড. বুকাইলি উল্লেখ করেন, এই আয়াতটি ভ্রূণের অবস্থান ও তার সুরক্ষার একটি চমৎকার বর্ণনা, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির আগে বলা এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

জমাট রক্তের পর্ব ও গোশতপিণ্ড

কুরআনের সবচেয়ে চমকপ্রদ বর্ণনাগুলোর একটি আসে ভ্রূণের ধাপে ধাপে পরিবর্তনের বিবরণে। সূরা মু'মিনূনের ১২-১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
"فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝"

অর্থ: "আর আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে এক ফোঁটা তরলে পরিণত করি এক নিরাপদ স্থানে। তারপর সেই তরলকে 'আলাকা'তে পরিণত করি, তারপর 'আলাকা'কে 'মুদগা'তে (গোশতপিণ্ড) পরিণত করি, তারপর মুদগা থেকে হাড় তৈরি করি, তারপর হাড়কে গোশত দিয়ে ঢেকে দেই। তারপর তাকে আরেক নতুন সৃষ্টিতে দাঁড় করাই। অতএব কত মহান আল্লাহ, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।"

এবার লক্ষ্য করি শব্দগুলোর বৈজ্ঞানিক অর্থের দিকে। 'আলাকা' শব্দের তিনটি অর্থ – জোঁক, রক্তপিণ্ড এবং কোনো কিছুকে ঝুলে থাকা। প্রাথমিক ভ্রূণ সত্যিই জোঁকের মতো জরায়ুর দেয়ালে ঝুলে থাকে এবং রক্ত থেকে পুষ্টি নেয়। এরপর 'মুদগা' অর্থাৎ চর্বণকৃত মাংসের টুকরার মতো দেখতে হয় ভ্রূণকে, যেখানে দেহের গঠনের প্রাথমিক ছাপ দেখা যায় কিন্তু স্পষ্ট হয় না। তারপর সেই মুদগা থেকে হাড়ের কাঠামো তৈরি হয়, এবং পরে তা মাংসে ঢাকা পড়ে। ড. বুকাইলি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞান

যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভ্রূণের ধাপগুলো চিহ্নিত করে, তখন দেখা যায় তা কুরআনের এই ক্রমিক বর্ণনার সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়। জনাব আল-গালিবও তার বইতে বলেন, নুতফা, আলাকা, মুদগা - এই তিনটি ধাপ আধুনিক ভ্রূণ গবেষণার মৌলিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কীভাবে নির্ধারিত হয় লিঙ্গ

মানুষের লিঙ্গ কীভাবে নির্ধারিত হয়, সেটিও আধুনিক জিনতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। আমরা জানি, পুরুষের শুক্রাণুতে X বা Y ক্রোমোজোম থাকে, আর নারীর ডিম্বাণুতে থাকে X ক্রোমোজোম। শুক্রাণু যদি X ক্রোমোজোম বহন করে তবে সন্তান হবে কন্যা, আর Y বহন করলে হবে পুত্র।

কুরআন এই ধারণার ইঙ্গিত দিয়েছে সূরা কিয়ামাহ-এর ৩৭-৩৯ নম্বর আয়াতে:

"أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُُمْنَىٰ، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَىٰ"

অর্থ: "সে কি এক ফোঁটা তরল ছিল না যা স্থাপিত হয়? তারপর সে 'আলাকা' হলো, তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন ও সুঠাম করলেন। তারপর তা থেকে জোড়া বানালেন - পুরুষ ও নারী।"

আয়াতটি স্পষ্ট করে বলছে, সেই তরল থেকেই পুরুষ বা নারী নির্ধারিত হয়। আধুনিক জিনবিজ্ঞান বলে, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় নিষিক্তকরণের সময়ই, আর তা নির্ভর করে পিতার শুক্রাণুর ওপর। এই তথ্যও কুরআনে বহুকাল আগে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

উপসংহার

এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম, মানব সৃষ্টির যে জটিল প্রক্রিয়া আধুনিক বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন, পবিত্র কুরআন তা সহজ

অথচ নিখুঁত ভাষায় বলে দিয়েছে সেই চৌদ্দশ বছর আগে। তুচ্ছ তরল থেকে শুরু করে, জরায়ুর নিরাপদ স্থানে অবস্থান, তিন অঙ্ককারের আবরণ, আলাকা-মুদগা-হাড়-গোশতের ক্রমিক ধাপ এবং লিঙ্গ নির্ধারণ – প্রতিটি ধাপেই মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের সত্যতা জ্বলজ্বল করে। ড. মরিস বুকাইলি এবং মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের মতো গবেষকরা এই বর্ণনাগুলোকে কুরআনের ঐশী উৎসের জোরালো প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আরেকটি বিস্ময়কর বিষয়ে যাব – পাহাড়ের ভূমিকা ও ভূতত্ত্ব নিয়ে কুরআনের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা।

তৃতীয় অধ্যায়: পাহাড়ের শিকড় ও ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন

পাহাড়ের সৌন্দর্য মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করেছে। আকাশছোঁয়া সুউচ্চ চূড়া, বরফাবৃত শৃঙ্গ, সবুজে ঘেরা টিলা – এসব যেন পৃথিবীর মাথার মুকুট। কিন্তু পাহাড় কি শুধুই মাটির ওপরের সৌন্দর্য? আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্যা আমাদের শিখিয়েছে, পাহাড়ের গভীরে আছে এক বিশাল শিকড়, যা মাটির নিচে প্রোথিত থাকে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, পবিত্র কুরআন এই সত্যটি বহুকাল আগেই জানিয়ে দিয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা পাহাড়ের ভূমিকা, তার গঠন এবং ভূতাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা নিয়ে কুরআনের আলোচিত আয়াতগুলো সহজ ভাষায় বুঝব।

পাহাড়কে পেরেকের সাথে তুলনা

আধুনিক বিজ্ঞান বলে, পর্বত বা পাহাড় কেবল মাটির ওপরে উঁচু হয়ে থাকে না; বরং এর একটা বড় অংশ ভূগর্ভের গভীরে প্রোথিত থাকে। এই গভীর শিকড়ই পাহাড়কে স্থিতিশীল রাখে। কুরআন ঠিক এভাবেই পাহাড়কে বর্ণনা করেছে। সূরা নাবা-এর ৬-৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا"

অর্থ: "আমি কি পৃথিবীকে বিছানা করিনি? এবং পাহাড়গুলোকে পেরেকস্বরূপ স্থাপন করিনি?"

‘আওতাদ’ শব্দটি ‘ওয়াতাদ’-এর বহুবচন, যার অর্থ পেরেক বা খুঁটি। পেরেকের যেমন একটা অংশ মাটির নিচে লুকানো থাকে, আর কিছু অংশ ওপরে দেখা যায়, ঠিক তেমনি পাহাড়েরও বিশাল অংশ পৃথিবীর গভীরে প্রোথিত, আর আমরা দেখি কেবল ওপরের ছোট অংশ। জনাব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার “বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন” বইতে আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্যার বরাত দিয়ে বলেন, পাহাড়ের ভূগর্ভস্থ শিকড় তার বাইরের দৃশ্যমান অংশের চেয়ে বহুগুণ গভীরে থাকে, যা পাহাড়কে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পৃথিবীর বুকে ধরে রাখে। ড. মরিস বুকাইলিও “The Bible, The Qur’an and

Science” বইতে একই কথা উল্লেখ করে বলেছেন, পাহাড়ের এই গঠন সম্পর্কে আধুনিক ভূতত্ত্বের জ্ঞান ছিল না চৌদ্দশ বছর আগে, কিন্তু কুরআন তা অত্যন্ত সরল উপমায় ফুটিয়ে তুলেছে।

ভূমিকম্প রোধে পাহাড়ের ভূমিকা

আমরা জানি, পৃথিবীর উপরিভাগ অনেকগুলো টেকটোনিক প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত। এই প্লেটগুলো ধীরে ধীরে নড়াচড়া করে, যার ফলে ভূমিকম্প হয়। কিন্তু পাহাড় যেখানে থাকে, সেখানে ভূত্বকের ভারসাম্য বজায় থাকে। পাহাড় আসলে অনেকটা নোঙরের মতো কাজ করে, যা প্লেটের চাপ ধরে রেখে ভূমিকম্পের প্রকোপ কমায়।

কুরআন পাহাড়ের এই ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়েছে। সূরা নাহল-এর ১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ"

অর্থ: "আর তিনি পৃথিবীতে পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে কেঁপে না ওঠে।"

‘রাওয়াসিয়া’ অর্থ সুদৃঢ় পর্বত, আর ‘তামীদা’ অর্থ কেঁপে ওঠা বা দোলা দেওয়া। অর্থাৎ পাহাড় পৃথিবীকে স্থির রাখার কাজ করে। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, পাহাড়ের শিকড় অনেকটা জাহাজের নোঙরের মতো ভূত্বকের ভারসাম্য রক্ষা করে।

আল-গালিব সাহেব তার বইতে লিখেছেন, এই আয়াতটি এক অনন্য বৈজ্ঞানিক নিদর্শন, কারণ তখনকার মানুষ ভাবতেও পারত না যে পাহাড়ের নিচের গঠন ভূমিকম্প প্রশমনে ভূমিকা রাখে।

পাহাড়ের বিভিন্ন রঙ ও বৈচিত্র্য

পাহাড়ের আরেকটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো তাদের রঙ ও ধরনের বৈচিত্র্য। ভূতত্ত্ববিদ্যা বলে, পাহাড়ের রঙ নির্ভর করে তার অভ্যন্তরীণ খনিজ পদার্থের ওপর। কোনো পাহাড় কালো গ্রানাইটের, কোনোটা লাল বেলেপাথরের, আবার কোনোটা সাদা চুনাপাথরের। এই পার্থক্যগুলো মানুষের জন্য শিক্ষণীয়। সূরা ফাতির-এর ২৭-২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ
"جُدَّدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ"

অর্থ: "তুমি কি দেখো না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন রঙের ফল উৎপন্ন করি? আর পাহাড়েও আছে বিভিন্ন রঙের স্তর – সাদা, লাল, নানা বর্ণের এবং গাঢ় কালো।"

এই আয়াত ভূতত্ত্বের একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরে। 'জুদাদ' অর্থ পথ বা স্তর, আর 'গারাবীবু সুদ' অর্থ গাঢ় কালো রঙের পাহাড়। ড. বুকাইলি উল্লেখ করেন, পাহাড়ের গঠন ও বিবিধ রঙের বর্ণনা কুরআন যে সহজ ও নিখুঁত উপায়ে দিয়েছে, তা ভূতত্ত্ব নিয়ে না পড়লে এখনো অনেকে বুঝতে পারবেন না।

পাহাড়ের চলন: একটি আধুনিক ধারণা

আমরা সাধারণত পাহাড়কে স্থির ও অচল মনে করি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলে, টেকটোনিক প্লেটের চলাচলের কারণে পাহাড়ও অত্যন্ত ধীরগতিতে স্থান পরিবর্তন করে। একে 'কন্টিনেন্টাল ড্রিফট' বা মহাদেশীয় প্রবাহ বলে। কুরআন বিস্ময়করভাবে এই চলনের ইঙ্গিত দিয়েছে। সূরা নামল-এর ৮৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ"

অর্থ: "আর তুমি পাহাড়কে দেখে স্থির ও অনড় মনে করো, অথচ তা মেঘের মতো চলতে থাকে।"

প্রথম পড়ায় মনে হতে পারে এটি কেয়ামতের দিনের বিবরণ। কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায়, পাহাড় যে একেবারে স্থির নয়, তা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, পৃথিবীর প্লেটগুলোর চলাচলের সাথে পাহাড়ও সরে। যদিও এই গতি অত্যন্ত ধীর – বছরে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার – তবুও তা থেমে নেই।

আল-গালিব সাহেব তার বইতে বলেন, এই আয়াত প্লেট টেকটোনিকসের মতো এক জটিল বৈজ্ঞানিক ধারণাকে অত্যন্ত সাধারণ উপমায় প্রকাশ করেছে। ড. বুকাইলিও মন্তব্য করেন, কুরআনের এই আয়াত ভূতত্ত্ববিদ্যার এক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী।

পাহাড়ের উপকারিতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ

পাহাড় শুধু সৌন্দর্য বা স্থিতিশীলতার জন্যই নয়, বরং এতে রয়েছে মানুষের জন্য অফুরন্ত সম্পদ। লোহা, তামা, সোনা-রূপাসহ নানা খনিজ পদার্থ পাহাড় থেকে আহরণ করা হয়। কুরআন এই কথাও বলেছে। সূরা হাদীদ-এর ২৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ"

অর্থ: "আর আমি লোহা নাজিল করেছি, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু উপকারিতা।"

‘আনঝালনা’ অর্থ নাজিল করা বা নামিয়ে দেওয়া। বিজ্ঞান বলে, লোহার মতো ভারী ধাতু পৃথিবীর অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছে এবং তা ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ওপরে উঠে এসেছে। পাহাড়ের এই খনিজ ভাণ্ডার ছাড়া আধুনিক সভ্যতা কল্পনাই করা যায় না।

উপসংহার

পাহাড় আল্লাহর এক অপার কুদরতের নিদর্শন। কুরআন পাহাড়কে পেরেকের সাথে তুলনা করে তার গভীর শিকড়ের কথা বলেছে, যা আধুনিক ভূতত্ত্বের মূল ভিত্তি। পৃথিবীর কম্পন ঠেকাতে পাহাড়ের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে সূরা নাহলে, যা আজকের প্লেট টেকটোনিকসের জ্ঞান ছাড়া বোঝা সম্ভব ছিল না। পাহাড়ের রঙের বৈচিত্র্য, তার ধীর চলন এবং খনিজ সম্পদের কথা – সবকিছু মিলিয়ে কুরআনের বর্ণনা অতুলনীয়। মরিস বুকাইলি ও আল-গালিবের মতো গবেষকদের মতে, এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে কুরআন কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়, বরং সর্বজ্ঞানী আল্লাহর বাণী।

চতুর্থ অধ্যায়: মহাসমুদ্রের মিলন ও নদীর বাধার রহস্য

পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে বিশাল সমুদ্র। এই মহাসমুদ্রের নীল জলের দিকে তাকালে মনে হয়, সব পানি বুঝি একই রকম। কিন্তু আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে, বিভিন্ন সমুদ্রের পানি আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, ঘনত্ব – সবকিছুতেই ভিন্নতা থাকে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে একটি অদৃশ্য বাধা কাজ করে, যা তাদের পানিকে সম্পূর্ণ মিশে যেতে দেয় না। পবিত্র কুরআন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগেই এই রহস্য উন্মোচন করেছে। একইভাবে নদী ও সমুদ্রের মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির মাঝেও যে অপূর্ব অন্তরাল থাকে, তাও কুরআন জানিয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই অলৌকিক বর্ণনাগুলো সহজ ভাষায় বুঝব।

দুই সমুদ্রের মিলন ও অদৃশ্য বাধা

আমরা যদি বিশ্বের মানচিত্রের দিকে তাকাই, দেখতে পাই ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর জিব্রাল্টার প্রণালীতে মিলিত হয়েছে। লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরও মিলেছে বাব-এল-মান্দেব প্রণালীতে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, এই দুই সমুদ্রের পানি পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমানা থাকে, যেখানে তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও ঘনত্বের তীব্র পরিবর্তন ঘটে। পানির পৃষ্ঠটানের কারণেও এই পৃথকীকরণ বজায় থাকে। এই সীমানাকে বিজ্ঞানীরা বলেন ‘থার্মোহ্যালাইন সীমানা’ বা ‘বারজাখ’ (আরবি শব্দ থেকে নেওয়া)।

কুরআন ঠিক এই ঘটনাই বর্ণনা করেছে। সূরা রাহমান-এর ১৯-২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ"

অর্থ: "তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন, যারা মিলিত হয়। তাদের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।"

‘বারজাখ’ শব্দের অর্থ বাধা, অন্তরাল বা সীমানা। ‘লা ইয়াবগিয়ান’ অর্থ তারা একে অপরের সীমা লঙ্ঘন করে না। ড. মরিস বুকাইলি তার “**The Bible, The Qur’an and Science**” বইতে বলেন, আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান যখন দুই সমুদ্রের মঝের এই বাধাটি আবিষ্কার করে, তখন তারা একে ‘বারজাখ’ নামেই অভিহিত করার কথা ভাবেন, কারণ কুরআনের এই বর্ণনা ছিল একেবারে নির্ভুল ও বৈজ্ঞানিক। জনাব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তার “বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন” বইতে উল্লেখ করেন, এই আয়াত একদিকে যেমন সমুদ্রবিদ্যার এক নিখুঁত তথ্য দেয়, তেমনি আল্লাহর অপরিমেয় ক্ষমতারও পরিচয় বহন করে।

মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির মিলন

শুধু দুই সমুদ্রই নয়, যেখানে নদী গিয়ে সমুদ্রে মেশে, সেখানেও এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। নদীর মিষ্টি পানি আর সমুদ্রের লবণাক্ত পানি পাশাপাশি মিলিত হয়, কিন্তু সহজে মিশে যায় না। নদীর মোহনায় গেলে বোঝা যায়, পানির রং, স্বাদ ও ঘনত্ব আলাদা থাকে। এই পৃথকীকরণের পেছনে কাজ করে পানির ভিন্ন ঘনত্ব ও পৃষ্ঠটানের নীতি।

কুরআন এই বাস্তবতারও বর্ণনা দিয়েছে। সূরা ফুরকান-এর ৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

অর্থ: "আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন – একটি মিষ্টি ও তৃষ্ণা নিবারক, অন্যটি লবণাক্ত ও তিক্ত। আর তিনি তাদের মাঝে স্থাপন করেছেন এক অন্তরাল ও এক অলঙ্ঘনীয় বাধা।"

এখানে ‘আযবুন ফুরাত’ অর্থ অত্যন্ত মিষ্টি ও সুস্বাদু পানি, যা নদীর পক্ষে প্রযোজ্য। আর ‘মিলছন উজাজ’ অর্থ অত্যন্ত লবণাক্ত ও তিক্ত পানি, যা সমুদ্রের বৈশিষ্ট্য। ‘হিজরাম মাহজুরা’ অর্থ এমন বাধা যা পুরোপুরি নিষিদ্ধ বা অলঙ্ঘনীয়। ড. বুকাইলি বলেন, এই

আয়াত নদী ও সমুদ্রের মিলনস্থলের যে বৈজ্ঞানিক সত্য উন্মোচন করে, তা ছিল সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের অজানা।

আল-গালিব সাহেবও তার বইতে এই আয়াতের প্রশংসা করে বলেন, এটি কুরআনের বৈজ্ঞানিক মুজিজার এক অনন্য নমুনা।

তিনটি অন্ধকারের সাগরতল

একটি আরও গভীর বিস্ময় অপেক্ষা করছে সমুদ্রের তলদেশে। আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞানীরা বলেন, সাগরের গভীরে যত যাওয়া যায়, আলো তত কমতে থাকে। প্রথমে দৃশ্যমান আলো হারিয়ে যায়, তারপর নীলচে অন্ধকার নেমে আসে, আর একেবারে তলদেশে পৌঁছলে তা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে যায়। একে বিজ্ঞানীরা বলেন ‘অ্যাফোটিক জোন’ বা আলোহীন অঞ্চল।

কুরআন এই গভীর সমুদ্রের অন্ধকারের বর্ণনা দিয়েছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। সূরা নূর-এর ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا

অর্থ: "অথবা (তাদের কাজ) গভীর সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকারের মতো, যাকে ঢেকে রাখে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যার ওপরে থাকে মেঘ। এক অন্ধকারের ওপর আরেক অন্ধকার, যখন কেউ হাত বের করে, তা দেখতে পায় না।"

এই আয়াতে গভীর সমুদ্রের যে স্তরভিত্তিক অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে, বিজ্ঞান তা পুরোপুরি স্বীকার করে। প্রথম অন্ধকারটি হলো মেঘের কারণে সূর্যের আলো ঢাকা পড়া, দ্বিতীয়টি সমুদ্রের উপরিতলের তরঙ্গ, তৃতীয়টি গভীর তরঙ্গ, আর চতুর্থটি হলো একেবারে গভীর সমুদ্রের তলদেশ। আল-গালিব সাহেব উল্লেখ করেন, সমুদ্রের এই অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ (Internal Waves) সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জানতে পেরেছেন, অথচ কুরআন তা বহুকাল আগেই বলে দিয়েছে। ড. বুকাইলিও বিস্ময় প্রকাশ করে

বলেন, সমুদ্রের গভীরতার এই নিখুঁত বিবরণ যে মানুষ লিখেছে, তা বিশ্বাস করা কঠিন; বরং এটি ঐশী জ্ঞানেরই ফসল।

মুক্তা ও প্রবালের ভাণ্ডার

সমুদ্রের আরেকটি বড় অবদান হলো তার রত্নভাণ্ডার – মুক্তা ও প্রবাল। এই মূল্যবান বস্তুগুলো মানুষের জীবনে সৌন্দর্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। কুরআন সূরা রাহমান-এর ২২ নম্বর আয়াতে বলেছে:

"يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ"

অর্থ: "উভয় সমুদ্র থেকে বের হয় মুক্তা ও প্রবাল।"

এই আয়াত সমুদ্রের সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা মানুষের উপকারে আসে। এখানে 'উভয় সমুদ্র' বলতে মিষ্টি ও নোনা পানির সমুদ্রের কথা বোঝানো হয়েছে বলে অনেক মুফাসসির মত দেন, আবার কেউ বলেন দুই ধরনের নোনা সমুদ্র। যাই হোক, মূল কথা হলো সমুদ্রের অভ্যন্তরে আল্লাহ অমূল্য রত্ন রেখেছেন, যা থেকে মানুষ উপকৃত হয়।

উপসংহার

মহাসমুদ্রের মিলন ও নদীর বাধার এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সমুদ্রবিজ্ঞানের অনেক আধুনিক আবিষ্কার কুরআন আগেই জানিয়েছিল। দুই সমুদ্রের মাঝে 'বারজাখ' বা অন্তরাল, নদী ও সমুদ্রের মিষ্টি-লবণ পানির অমিশ্রতা, গভীর সমুদ্রের স্তরবদ্ধ অঙ্ককার এবং সমুদ্রের রত্নভাণ্ডার – সবই কুরআনের অলৌকিকতার প্রমাণ। ড. মরিস বুকাইলি ও মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের গবেষণা আমাদের এ বিশ্বাসে দৃঢ় করে যে, কুরআন সত্যিই আল্লাহর বাণী। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আরেক চমকপ্রদ নিদর্শন – মেঘ, বৃষ্টি ও পানি চক্রের ওপর কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করব।

পঞ্চম অধ্যায়: মেঘ, বৃষ্টি ও পানি চক্রের নিখুঁত বর্ণনা

বৃষ্টি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে খাবার পানি, নদী-নালা, খাল-বিল সবকিছুর জন্যই বৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু বৃষ্টি আসে কোথা থেকে, কীভাবে তৈরি হয় মেঘ, আর পুরো পানি চক্র কীভাবে কাজ করে – এসব জানতে আধুনিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ সময় লেগেছে। অথচ পবিত্র কুরআন চৌদ্দশ বছর আগেই বৃষ্টি চক্রের বর্ণনা দিয়েছে যা আজকের আবহাওয়া বিজ্ঞানের সাথে হুবহু মিলে যায়। এই অধ্যায়ে আমরা সেই নিখুঁত বর্ণনাগুলো খুব সহজ ভাষায় বুঝব।

বায়ু মেঘের বাহক

বৃষ্টির প্রথম ধাপ শুরু হয় বায়ুপ্রবাহ দিয়ে। সমুদ্রের পানির ওপর দিয়ে যখন বাতাস বয়ে যায়, তখন তা জলীয় বাষ্প বহন করে আকাশে নিয়ে যায়। আধুনিক আবহাওয়াবিদ্যা এই প্রক্রিয়াকে ‘বাপ্পীভবন’ ও ‘পরিচলন’ নামে চিহ্নিত করে। এই বায়ুপ্রবাহকেই মেঘ সৃষ্টির প্রথম চালক শক্তি বলা হয়।

কুরআন এই ধাপের ইঙ্গিত দিয়েছে সূরা হিজর-এর ২২ নম্বর আয়াতে। আল্লাহ বলেন:

"وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ"

অর্থ: "আর আমি বাতাস প্রেরণ করি গর্ভধারণকারী রূপে, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে তোমাদের পান করাই।"

এখানে ‘লাওয়াকিহা’ শব্দটি এসেছে ‘লাকাহা’ থেকে, যার অর্থ গর্ভধারণ করা। অর্থাৎ বাতাস মেঘের বীজ ধারণ করে, যেমন গাছ পরাগায়নের মাধ্যমে ফল ধারণ করে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, বাতাস সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলকণাকে নিয়ে যায়, যা পরে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। ড. মরিস বুকাইলি তার “**The Bible, The Qur’an and Science**” বইতে এই আয়াতের প্রশংসা করে বলেন, বাতাসের এই নিষিক্তকারী ভূমিকা সম্পর্কে সপ্তদশ শতাব্দীর আগে কেউ জানত না।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবও তার “বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন” বইতে বলেন, লাওয়াকিহ শব্দটি একাধারে জৈবিক ও আবহাওয়াগত সত্য প্রকাশ করে, যা অত্যন্ত চমকপ্রদ।

মেঘের স্তরভিত্তিক গঠন

আমরা আকাশে তাকালে মেঘকে একটাই পিণ্ড মনে করি। কিন্তু আবহাওয়াবিজ্ঞান বলে, মেঘ স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। প্রথমে ছোট ছোট মেঘখণ্ড আলাদাভাবে উড়তে থাকে, তারপর বাতাস তাদের এক জায়গায় জড়ো করে। জড়ো হওয়ার পর তারা পরস্পরের ওপরে উঠতে থাকে এবং স্তূপাকারে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়। এভাবে তৈরি হয় বিশাল বৃষ্টি মেঘ, যাকে ‘কিউমুলোনিম্বাস’ বলা হয়।

কুরআন মেঘের এই গঠনপ্রক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। সূরা নূর-এর ৪৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ"

অর্থ: "তুমি কি দেখ না, আল্লাহ মেঘকে ধীরে ধীরে চালিত করেন, তারপর তা একত্রিত করেন, তারপর স্তূপাকার করেন, তারপর তুমি দেখো বৃষ্টির ধারা তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসছে।"

এই আয়াতের শব্দগুলো এতটাই বৈজ্ঞানিক যে তা বিস্মিত করে। ‘ইউঝাজী’ অর্থ ধীরে ধীরে চালিত করা, ‘ইউআল্লিফু’ অর্থ জোড়া লাগানো বা একত্রিত করা, ‘রুকামা’ অর্থ স্তূপীকৃত বা একটির ওপর আরেকটি, আর ‘ওয়াদকা’ অর্থ বৃষ্টি। ‘মিন খিলালিহী’ অর্থ তার মধ্যস্থল দিয়ে, অর্থাৎ মেঘের ভেতর দিয়ে বৃষ্টি বেরিয়ে আসা। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, কিউমুলোনিম্বাস মেঘের কেন্দ্র থেকে বৃষ্টি নামে। ড. বুকাইলি উল্লেখ করেন, মেঘ সৃষ্টির এই ধাপগুলো নিয়ে ১৯৪০ সালের আগে আবহাওয়াবিজ্ঞানে পরিষ্কার ধারণা ছিল না।

উল্লসভাবে বেড়ে ওঠা মেঘ ও শিলাবৃষ্টি

মেঘ যখন আরও ঘনীভূত হয়, তখন তা ওপরের দিকে উঠতে থাকে এবং এক ধরনের পর্বতের আকৃতি পায়। এ সময় মেঘের ভেতরে নানা স্তরে তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে শিলা বা বরফখণ্ড তৈরি হয়। এই বরফখণ্ডগুলো বড় বড় হয়ে নিচে পড়ে শিলাবৃষ্টির সৃষ্টি করে।

কুরআন সূরা নূর-এর ৪৩ নম্বর আয়াতের শেষাংশে এই বর্ণনাই দিয়েছে। উক্ত আয়াতের ধারাবাহিকতায় আল্লাহ বলেন:

"وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ"

অর্থ: "আর তিনি আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি নামান, যা আসে আকাশের (মেঘের) পর্বত থেকে, তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা রক্ষা করেন।"

এখানে 'মিন জিবালিন ফীহা মিম বারাদিন' বলতে মেঘের ভেতরে বরফের পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক আবহাওয়াবিদ্যা বলে, বিশাল কিউমুলোনিম্বাস মেঘের ভেতরে বরফের স্ফটিক ও শিলা জমা হয়, যা নিচে পতিত হলে শিলাবৃষ্টি হয়। আল-গালিব সাহেব বলেন, এই আয়াত শিলাবৃষ্টির প্রক্রিয়া ও মেঘের অভ্যন্তরীণ গঠন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, যা কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিজার প্রমাণ।

পানি চক্রের সম্পূর্ণ বর্ণনা

এখন পর্যন্ত আমরা মেঘ সৃষ্টি, বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি দেখলাম। কিন্তু পানি কীভাবে সমুদ্র থেকে আকাশে যায়, মেঘ হয়ে বৃষ্টি হয়ে আবার নদী-নালায় ফিরে আসে – এই পুরো চক্র সম্পর্কে প্রাচীন যুগে নানা ভুল ধারণা ছিল। অনেকে ভাবতেন বৃষ্টি আসে নদীর নিচ থেকে কোনো অজানা উৎস থেকে। কিন্তু কুরআন পুরো পানি চক্রের সঠিক বর্ণনা দিয়েছে বিভিন্ন আয়াতে সম্মিলিতভাবে।

সূরা যুমার-এর ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ"

অর্থ: "তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা মাটিতে প্রস্রবণ বা ঝরনারূপে প্রবাহিত করেন।"

আর সূরা রুম-এর ৪৮ নম্বর আয়াতে বলেন:

"اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى
"الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ"

অর্থ: "আল্লাহই বাতাস প্রেরণ করেন, যা মেঘ সৃষ্টি করে; তারপর তা আকাশে ছড়িয়ে দেন যেভাবে ইচ্ছা; তারপর তা খণ্ড খণ্ড করেন; তারপর তুমি দেখো বৃষ্টি বের হয়ে আসে তার মধ্য থেকে।"

এই আয়াতগুলো একত্র করলে আমরা পাই একটি সম্পূর্ণ পানি চক্রের চিত্র: বাতাস সমুদ্রের পানি নিয়ে মেঘ তৈরি করে, সেই মেঘ ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির পানি মাটিতে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলাধার ও ঝরনা তৈরি করে এবং পরে নদী হয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। ড. বুকাইলি এই চক্রকে কুরআনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল-গালিব সাহেবও বলেন, ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ইউরোপের বিজ্ঞানীরাও সঠিক পানি চক্র জানতেন না, অথচ কুরআন তা বলে দিয়েছে বহু আগে।

পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি

শেষ আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য হলো, বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। আবহাওয়াবিজ্ঞান বলে, প্রতি বছর পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি হয় এবং এই পরিমাণে তেমন

কোনো তারতম্য হয় না। কুরআন সূরা যুখরুফ-এর ১১ নম্বর আয়াতে এই ইঙ্গিত দিয়েছে। আল্লাহ বলেন:

"وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ"

অর্থ: "আর যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন নির্দিষ্ট পরিমাণে।"

‘বিকাদার’ শব্দের অর্থ পরিমাপমতো, নির্ধারিত মাত্রায়। আধুনিক গবেষণা বলে, পৃথিবীতে প্রতি বর্গমিটারে বছরে গড়ে প্রায় এক মিটার বৃষ্টিপাত হয় এবং এই হিসাব বহুকাল ধরে মোটামুটি স্থিতিশীল। আল-গালিব সাহেব উল্লেখ করেন, পানি চক্রের এই সুনিয়ন্ত্রিত ভারসাম্য আল্লাহর এক বড় নিদর্শন।

উপসংহার

মেঘ, বৃষ্টি ও পানি চক্র সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা পড়লে সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বাতাসের গর্ভধারণ, মেঘের স্তরভিত্তিক গঠন, উল্লম্ব মেঘের অভ্যন্তরে শিলার উপস্থিতি, ভূগর্ভস্থ পানির উৎস এবং বৃষ্টির নির্ধারিত পরিমাণ – এসবই আধুনিক আবহাওয়াবিজ্ঞানের মূল কথা। ড. মরিস বুকাইলি ও আল-গালিব সাহেবের মতে, এসব আয়াত প্রমাণ করে কুরআন কোনো মানুষের লেখা নয়; এটি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টার বাণী। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আরও বিস্ময়কর বিষয় – কুরআনের আলোকে উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা করব।

ষষ্ঠ অধ্যায়: উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য

এই বিশাল পৃথিবীতে আমরা কত রকমের গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি দেখি। এদের সবার জীবন একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রতিটি জীবের ভূমিকা আছে। আধুনিক জীববিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যা (ইকোলজি) আমাদের শিখিয়েছে, প্রকৃতির এই বিচিত্র জগৎ আল্লাহর অপূর্ব নিয়মে চলছে। পবিত্র কুরআন চৌদ্দশ বছর আগেই উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের এই ভারসাম্যের কথা অত্যন্ত গভীরভাবে বর্ণনা করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই বর্ণনাগুলো সহজ ভাষায় বুঝব।

জীবজগতের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

আমরা সবাই জানি, প্রাণীজগতে সাধারণত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মিলনে বংশবৃদ্ধি হয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, শুধু প্রাণী নয়, উদ্ভিদের মধ্যেও পুরুষ ও স্ত্রী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনেক গাছে আলাদা পুরুষ ও স্ত্রী ফুল হয়, পরাগায়নের মাধ্যমে ফল সৃষ্টি হয়। এমনকি অদৃশ্য জীবাণু পর্যন্ত জোড়ায় জোড়ায় বংশবৃদ্ধি করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাবিশ্বের সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি – ইলেকট্রন-প্রোটন, ধনাত্মক-ঋণাত্মক, সব কিছুতে জোড়ার ধারণা বিদ্যমান।

কুরআন এই সর্বজনীন নীতির বর্ণনা দিয়েছে। সূরা ইয়াসীন-এর ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ"

অর্থ: "পবিত্র সেই সত্তা, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন সব কিছু – যমীন যা উৎপন্ন করে তা থেকে, তাদের নিজেদের মধ্য থেকে এবং যা তারা জানে না তা থেকেও।"

এই আয়াত খুবই বিস্তৃত অর্থবহ। 'আযওয়াজ' অর্থ জোড়া বা স্ত্রী-পুরুষ। মাটি থেকে যা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উদ্ভিদের মধ্যেও আছে জোড়া। মানুষের নিজেদের মধ্যেও নারী-

পুরুষ জোড়া। আর ‘যা তারা জানে না’ বলতে এমন সব জিনিস বোঝানো হয়েছে, যা তখন মানুষের আবিষ্কারের বাইরে ছিল।

ড. মরিস বুকাইলি তার “**The Bible, The Qur’an and Science**” বইতে বলেছেন, অনুজীব ও পদার্থের অভ্যন্তরীণ জোড়ার ধারণা বিজ্ঞানীরা বিশ শতকে এসে জানতে পেরেছেন, অথচ কুরআন তা ইঙ্গিত করেছে সেই চৌদ্দশ বছর আগে।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবও তার “বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন” বইতে বলেন, এই আয়াত আধুনিক জিনতত্ত্ব ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য এক বিশাল মুজিজা।

উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির কেন্দ্র: সবুজ পত্র

উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য তৈরি করে, তা জানতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, গাছের সবুজ পাতাই হলো খাদ্য তৈরির কারখানা। সূর্যের আলো, পানি ও বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে পাতায় ‘ফটোসিন্থেসিস’ বা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনও তৈরি হয়, যা মানুষ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য জরুরি।

কুরআন উদ্ভিদের সবুজ অংশের গুরুত্ব বোঝাতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেছে। সূরা আনআম-এর ৯৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ
"مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا"

অর্থ: "তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন; তারপর তার দ্বারা সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; তারপর তা থেকে সবুজ পাতা বের করি; তারপর তা থেকে স্তরে স্তরে শস্যদানা বের করি।"

এখানে ‘খাদির’ শব্দের অর্থ সবুজ। কুরআন সবুজ অংশকেই উদ্ভিদের মূল খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে ইঙ্গিত করেছে। আল-গালিব সাহেব বলেন, এই আয়াত

পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব তুলে ধরে, যেখানে পাতাই হলো খাদ্য তৈরির প্রধান জায়গা।

পরাগায়ন ও ফল সৃষ্টি

ফল কীভাবে সৃষ্টি হয়, তা নিয়েও প্রাচীনকালে নানা ভুল ধারণা ছিল। আজকের উদ্ভিদবিজ্ঞান বলে, পুরুষ ফুলের পরাগরেণু স্ত্রী ফুলের গর্ভাশয়ে পৌঁছালে তবেই ফল তৈরি হয়। এই পরাগায়নের কাজ করে বাতাস, মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি।

কুরআন ফলের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে সূরা রাদ-এর ৪ নম্বর আয়াতে। আল্লাহ বলেন:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ
يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ

অর্থ: "পৃথিবীতে আছে পাশাপাশি বিভিন্ন জমি টুকরো, আঙুরের বাগান, শস্যক্ষেত, একই শিকড় থেকে অনেকটি বা আলাদা আলাদা শিকড়ের খেজুর গাছ; একই পানি দিয়ে এদের সেচ করা হয়, অথচ খাওয়ার ক্ষেত্রে আমি একটিকে আরেকটির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেই।"

এখানে 'সিনওয়ান ওয়া গাইরু সিনওয়ান' অর্থ একই গোড়া থেকে একাধিক গাছ বা আলাদা আলাদা গাছ। এই আয়াত উদ্ভিদের প্রজনন ও বৈচিত্র্যের দিকে ইঙ্গিত করে। ড. বুকাইলি বলেন, কুরআনের উদ্ভিদ বর্ণনা প্রাচীনকালের কৃষিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত।

প্রাণীজগতের নিজস্ব সমাজ ও ভাষা

আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞান বলে, প্রতিটি প্রাণীর নিজস্ব সামাজিক জীবন ও যোগাযোগের মাধ্যম আছে। পিঁপড়া থেকে শুরু করে পাখি পর্যন্ত সবাই নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময়

করে। মৌমাছির নৃত্য করে খাদ্যের উৎসের দিক জানায়, পাখিরা ডেকে বিপদ সংকেত দেয়, ডলফিন শব্দতরঙ্গে কথা বলে।

কুরআন এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। সূরা আনআম-এর ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ"

অর্থ: "আর পৃথিবীতে চলাচলকারী কোনো প্রাণী অথবা ডানা দিয়ে উড়ন্ত কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদের মতোই একেকটি সম্প্রদায় নয়।"

এই আয়াত প্রাণীদের সামাজিক জীবনের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। 'উমামুন আমসালুকুম' অর্থ তোমাদেরই মতো সম্প্রদায় বা জাতি। আল-গালিব সাহেব বলেন, প্রাণীদের যে নিজস্ব সমাজব্যবস্থা ও যোগাযোগ পদ্ধতি আছে, তা বিজ্ঞান বহু পরে আবিষ্কার করলেও কুরআন তা প্রাচীনকালেই জানিয়ে দিয়েছে।

আরও নির্দিষ্টভাবে মৌমাছির আচরণের বর্ণনা এসেছে সূরা নাহল-এ। সূরা নাহল-এর ৬৮-৬৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ثُمَّ كُلِّي
"مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا"

অর্থ: "আর তোমার রব মৌমাছিকে নির্দেশ দিলেন – পাহাড়, গাছ এবং মানুষ যা তৈরি করে তা থেকে ঘর বানাও। তারপর সব ধরনের ফল থেকে খাও এবং তোমার রবের সহজ পথে চলো।"

এই আয়াতে মৌমাছির জীবনযাপন, খাদ্য সংগ্রহ ও বাসা তৈরির এক নিখুঁত বর্ণনা আছে। মৌমাছিকে স্ত্রীবাচক শব্দে সম্বোধন করাও একটি বৈজ্ঞানিক মু'জিজা, কারণ বিজ্ঞান বলে, শ্রমিক মৌমাছির সবাই স্ত্রী, যারা মধু সংগ্রহ ও ঘর বানানোর কাজ করে।

ড. বুকাইলি এটিকে কুরআনের ভাষাগত ও বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রতিটি জীবনের গুরুত্ব ও বাস্তবত্বের ভারসাম্য

আধুনিক বাস্তববিদ্যা বলে, প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদ কোনো না কোনোভাবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। খাদ্যশৃঙ্খলের ছোট একটি জীবও যদি বিলুপ্ত হয়, পুরো বাস্তবত্ব ধ্বংস হতে পারে। কুরআন এই ভারসাম্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে।

সূরা রাহমান-এর ১০-১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ"

অর্থ: "আর পৃথিবীকে তিনি সব সৃষ্টির জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন। তাতে আছে ফল, খেজুর গাছ যা থোরে ঢাকা, এবং খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল।"

‘লিল আনাম’ অর্থ সব সৃষ্টির জন্য, শুধু মানুষের জন্য নয়। অর্থাৎ পৃথিবীর সম্পদ সবার জন্য, এবং সবার সম্মিলিত উপস্থিতিই ভারসাম্য রক্ষা করে। আল-গালিব সাহেব বলেন, এই আয়াত আধুনিক বাস্তবত্বের ধারণাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

উপসংহার

উদ্ভিদ থেকে প্রাণীজগৎ, সবকিছুতেই কুরআনের বর্ণনা যেন এক জীবন্ত বিজ্ঞানগ্রন্থ। জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির নীতি, উদ্ভিদের সবুজ পাতায় খাদ্য তৈরি, পরাগায়নের মাধ্যমে ফলধারণ, প্রাণীদের নিজস্ব সমাজ ও যোগাযোগ এবং বাস্তবত্বের ভারসাম্য – প্রতিটি বিষয়ে কুরআন এমন নিখুঁত তথ্য দিয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সম্প্রতি। ড. মরিস বুকাইলি ও জনাব আল-গালিবের মতো গবেষকদের মতে, এই জ্ঞান কোনো মানুষ নিজে থেকে চৌদ্দশ বছর আগে লিখতে পারে না। এটি অবশ্যই

ঐশী জ্ঞান। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা মানবদেহ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে
কুরআনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

সপ্তম অধ্যায়: মানবদেহ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিদর্শন

মানবদেহ আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি। আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি কোষ এত নিখুঁতভাবে কাজ করে যা দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ আমাদের শরীরের অনেক রহস্য উন্মোচন করেছে। অথচ পবিত্র কুরআন চৌদ্দশ বছর আগেই মানবদেহ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কিছু রোগ নিরাময়ের বিষয়ে এমন সব তথ্য দিয়েছে, যা আধুনিক মেডিকেল সায়েন্সের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এই অধ্যায়ে আমরা সহজ ভাষায় সেসব নিদর্শন বুঝব।

ত্বক: ব্যথা অনুভবের কেন্দ্র

আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হলো ত্বক বা চামড়া। এই ত্বকের মাধ্যমেই আমরা গরম-ঠাণ্ডা, ব্যথা-যন্ত্রণা ও স্পর্শ অনুভব করি। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, ত্বকের গভীরে অসংখ্য স্নায়ুকোষ বা নার্ভ এন্ডিং ছড়িয়ে আছে, যা মস্তিষ্কে সংকেত পাঠিয়ে ব্যথার অনুভূতি তৈরি করে। ত্বক পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে সেই অনুভূতি আর থাকে না; তখন আর ব্যথা বোঝা যায় না, কিন্তু ক্ষত আরও ভয়াবহ হয়।

কুরআন জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ দিতে গিয়ে এই চিকিৎসা সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছে। সূরা নিসা-এর ৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
"لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ"

অর্থ: "যারা আমার আয়াত প্রত্যাখ্যান করে, আমি তাদের আগুনে নিক্ষেপ করব। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই আমি তা নতুন চামড়ায় বদলে দেব, যাতে তারা শাস্তি আন্বাদন করতে পারে।"

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, চামড়া পুড়ে গেলে ব্যথা অনুভব শেষ হয়ে যায়, কিন্তু নতুন চামড়া এলে আবার ব্যথা অনুভব হয়। ড. মরিস বুকাইলি তার "The Bible,

The Qur'an and Science” বইতে বলেন, ত্বকে ব্যথা অনুভবের স্নায়ুকেন্দ্র সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান যা জানে, তার সাথে এই আয়াতটি চমৎকারভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবও তার “বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন” বইতে লেখেন, এই আয়াত চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এক অনন্য নিদর্শন।

আঙুলের ছাপ: একক ও অনন্য পরিচয়

পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, সবার আঙুলের ছাপ আলাদা। এমনকি একই যমজ শিশুরও আঙুলের ছাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। ১৮৮০ সালে সর্বপ্রথম আঙুলের ছাপকে শনাক্তকরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। এখন এটি ফরেনসিক বিজ্ঞান ও নিরাপত্তার জগতে অপরিহার্য।

কিন্তু কুরআন এই অনন্যত্বের কথা বহু আগেই ঘোষণা করেছে। সূরা কিয়ামাহ-এর ৩-৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ"

অর্থ: "মানুষ কি মনে করে আমি তার হাড়গুলোকে একত্রিত করতে পারব না? অবশ্যই পারব, এবং আমি তো তার আঙুলের ডগাগুলোকেও পুনরায় ঠিক আগের মতো তৈরি করতে সক্ষম।"

এখানে ‘বানান’ শব্দের অর্থ আঙুলের মাথা বা ডগা। এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, তিনি শুধু হাড় জোড়া লাগাবেন না, বরং আঙুলের ডগার সেই সূক্ষ্ম ছাপও অবিকল পুনরায় তৈরি করবেন। আল-গালিব সাহেব বলেন, আঙুলের ছাপের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কুরআন যেভাবে তুলে ধরেছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর, কারণ সে যুগে এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যবহার ছিল না। ড. বুকাইলিও এই আয়াতকে মানবদেহের এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

মধু: প্রাকৃতিক আরোগ্যদায়ক

প্রাচীনকাল থেকেই মধু খাদ্য ও ঔষুধ দুই হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আধুনিক গবেষণা বলছে, মধুতে আছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও প্রদাহনাশক উপাদান। এটি ক্ষত সারাতে, কাশি কমাতে এবং হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। মধুকে বলা হয় প্রকৃতির ‘সুপারফুড’।

কুরআন সরাসরি মধুকে আরোগ্যের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছে। সূরা নাহল-এর ৬৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ"

অর্থ: "তার (মৌমাছির) পেট থেকে নির্গত হয় এক পানীয়, যার রং বিভিন্ন রকমের। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য।"

‘শিফা’ শব্দের অর্থ আরোগ্য বা রোগ নিরাময়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন মধুর যে গুণাগুণ স্বীকার করছে, কুরআন তা বহুকাল আগে ঘোষণা করে দিয়েছে। আল-গালিব সাহেব লেখেন, এই আয়াতটি কেবল একটি ধর্মীয় বাণী নয়, বরং এটি প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক অমূল্য নির্দেশিকা। ড. বুকাইলিও একে আধুনিক ফার্মাকোলজির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

হৃদপিণ্ড: চিন্তা ও অনুভূতির কেন্দ্র

আমরা সাধারণত বলি, মস্তিষ্কই চিন্তা ও অনুভূতির একমাত্র কেন্দ্র। কিন্তু আধুনিক নিউরোকার্ডিওলজি একটি চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেছে – হৃদপিণ্ডেরও নিজস্ব একধরনের ‘মস্তিষ্ক’ আছে, যাকে বলা হয় ‘কার্ডিয়াক ব্রেন’। হৃদপিণ্ডে প্রায় ৪০,০০০ স্নায়ুকোষ থাকে, যা সরাসরি মস্তিষ্কের সাথে যোগাযোগ রাখে এবং আবেগ, অনুভূতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে।

কুরআন বারবার হৃদপিণ্ডকে বোঝার ও উপলব্ধির কেন্দ্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। সূরা হজ্জ-এর ৪৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ"

অর্থ: "বাস্তবে চোখ অন্ধ হয় না, বরং বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়গুলোই অন্ধ হয়।"

এখানে হৃদয়কে বোঝার কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ড. বুকাইলি বলেন, কুরআন যখন হৃদয়কে চিন্তা ও অনুভূতির জায়গা বলে, তখন আধুনিক বিজ্ঞানীদের অনেকে তা প্রতীকী অর্থে নিতেন। কিন্তু সম্প্রতি কার্ডিয়াক নিউরোলজির আবিষ্কার দেখাচ্ছে, হৃদয় সত্যিই অনুভূতি ও চিন্তায় ভূমিকা রাখে। জনাব আল-গালিবও এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত হিসেবে গণ্য করেন।

পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি

আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূলমন্ত্র হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। রোগ প্রতিরোধে হাত ধোয়া, গোসল করা, দাঁত পরিষ্কার করা – এগুলো এখন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থারও সুপারিশ। অথচ ইসলাম শুরু থেকেই পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ ঘোষণা করেছে। কুরআনে আল্লাহ সূরা বাকারা-র ১২৫ নম্বর আয়াতে বলেন:

"أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي"

অর্থ: "তোমরা আমার গৃহকে পবিত্র রাখো।"

আর সূরা মায়িদা-র ৬ নম্বর আয়াতে ওয়ু ও গোসলের বিধান দিয়ে বলা হয়েছে:

"مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ"

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের কোনো কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান।"

এই আয়াতগুলো ইসলামের পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব তুলে ধরে। দিনে পাঁচবার ওযু করা, যা হাত-মুখ-পা ধোয়ার এক পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি, তা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

আল-গালিব সাহেব লেখেন, করোনা মহামারীর সময় যখন পুরো বিশ্ব বারবার হাত ধোয়ার গুরুত্ব বুঝল, তখন ইসলামের এই শিক্ষা কতটা আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত তা স্পষ্ট হলো।

খাদ্যাভ্যাস ও হারাম-হালালের স্বাস্থ্যগত দিক

কুরআন মদ, মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের মাংস নিষিদ্ধ করেছে। সূরা বাকারা-র ১৭৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ"

অর্থ: "তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের মাংস।"

আধুনিক বিজ্ঞান এখন বলছে, শূকরের মাংসে অনেক ক্ষতিকর পরজীবী ও চর্বি থাকে, যা হৃদরোগ ও অন্যান্য রোগের কারণ। মৃত প্রাণী ও রক্তেও জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে। মদ নেশা ও লিভার সিরোসিসের কারণ। এসব নিষেধাজ্ঞা যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে ড. বুকাইলি তাঁর বইতে বিস্তারিত লিখেছেন। আল-গালিব সাহেবও বলেন, ইসলামের হালাল-হারামের বিধান গোটা মানবজাতির জন্য এক স্বাস্থ্যবিধি, যা আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের সাথে মিলে যায়।

উপসংহার

মানবদেহের গঠন, ত্বকের ব্যথা অনুভব, আঙুলের অনন্য ছাপ, মধুর আরোগ্যগুণ, হৃদপিণ্ডের অনুভূতি-ক্ষমতা, পরিচ্ছন্নতার বিধান এবং খাদ্যভ্যাসের নিয়ম – সবকিছুতেই কুরআনের বাণী আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে মিলে যায়। এ থেকে স্পষ্ট হয়, কুরআন নিছক ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, এটি স্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবনের এক পরিপূর্ণ গাইড।

ড. মরিস বুকাইলি ও মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের গবেষণা আমাদের এ বিশ্বাসে পৌঁছে দেয় যে, এই জ্ঞান চৌদশ বছর আগে কোনো মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী। পরবর্তী ও শেষ অধ্যায়ে আমরা পুরো থিসিসের সারসংক্ষেপ ও উপসংহার উপস্থাপন করব।

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার ও সারসংক্ষেপ

সারসংক্ষেপ

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শনসমূহ নিয়ে আমাদের এই থিসিস যাত্রা শুরু করেছিল এক সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে: চৌদ্দশ বছর আগের এক গ্রন্থে কি সত্যিই এমন তথ্য থাকা সম্ভব, যা একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করছেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, তার ভাষাগত সৌন্দর্য ও বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতগুলোকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করেছি। প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি একেকটি বিস্ময়কর জগৎ, যা আমাদের বিশ্বাসকে করেছে আরও দৃঢ়।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্যে ডুব দিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, কীভাবে সূরা আশ্বিয়ার আলোকে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সূরা যারিয়াতের সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ঘোষণা এবং সূরা তাকভীরের ‘খুন্নাস’ ও ‘কুন্নাস’ দিয়ে ব্ল্যাক হোলের ইঙ্গিত – সবই যেন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক অগ্রিম ঘোষণা। যে জ্ঞান অর্জনে বিজ্ঞানীদের শত শত বছর লেগেছে, কুরআন তা দিয়ে দিয়েছে এক পলকেই।

দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল মানব জ্ঞাতত্ত্বের ওপর। সেখানে আমরা দেখেছি, এক তুচ্ছ তরল থেকে কীভাবে ধাপে ধাপে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে ওঠে, আর কুরআন তার কতটা নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে। ‘আলাকা’, ‘মুদগা’, হাড়ে মাংস পরানোর প্রক্রিয়া – সবই আজকের জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল কথা। লিঙ্গ নির্ধারণের যে রহস্য জিনতত্ত্ব আবিষ্কার করেছে বিশ শতকে, কুরআন তার ইঙ্গিত দিয়েছে চৌদ্দশ বছর আগেই।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা পাহাড়ের শিকড় ও ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করেছি। পাহাড়কে পেরেকের সাথে তুলনা করে তার ভূগর্ভস্থ শিকড়ের ইঙ্গিত, ভূমিকম্প রোধে পাহাড়ের ভূমিকা এবং পাহাড়ের ধীর চলন – এসব আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্যারই প্রতিধ্বনি।

চতুর্থ অধ্যায় ছিল সমুদ্রবিজ্ঞানের ওপর। দুই সাগরের মিলনস্থলে ‘বারজাখ’ বা অদৃশ্য বাধা, নদী-সমুদ্রের মিষ্টি-নোনা পানির অমিশ্রতা এবং গভীর সমুদ্রের স্তরবদ্ধ অন্ধকার – প্রতিটি বর্ণনাই যেন সমুদ্রবিজ্ঞানীদের জন্য এক অগ্রিম পথপ্রদর্শক।

পঞ্চম অধ্যায়ে মেঘ, বৃষ্টি ও পানি চক্রের ওপর কুরআনের নিখুঁত বর্ণনা তুলে ধরেছি। বাতাসের গর্ভধারণ, মেঘের স্তরীভবন, শিলাবৃষ্টির জন্য মেঘের অভ্যন্তরে বরফ পাহাড়ের কথা এবং পুরো পানি চক্র – সবই আবহাওয়াবিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞানের সাথে মিলে যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করেছিলাম জীববৈচিত্র্যের জগতে। জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির নীতি, উদ্ভিদের সবুজ পাতায় খাদ্য তৈরি, পরাগায়ন, প্রাণীদের নিজস্ব সমাজ ও যোগাযোগব্যবস্থা – কুরআনের এসব বর্ণনা যেন প্রকৃতির প্রতিটি স্তরের এক জীবন্ত দলিল।

সপ্তম অধ্যায় ছিল মানবদেহ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে। হৃকের ব্যথা অনুভব, আঙুলের ছাপের স্বতন্ত্রতা, মধুর আরোগ্যগুণ, হৃদয়ের অনুভূতি ক্ষমতা, ইসলামের পরিচ্ছন্নতার বিধান এবং হালাল-হারামের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা – সবই প্রমাণ করে ইসলাম ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একই সূত্রে গাঁথা।

কুরআনের আরও কিছু বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত :

উপরোক্ত আট অধ্যায়ে কুরআনের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু কুরআনের প্রতিটি আয়াতই যেন জ্ঞানের এক সমুদ্র। এখানে সংক্ষেপে আরও কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হলো :

১. লোহার উৎস পৃথিবীর বাইরে

সূরা হাদীদ-এর ২৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আমি লোহা নাজিল করেছি।" ‘আনঝালনা’ শব্দটি আকাশ থেকে নামানোর অর্থে ব্যবহৃত। আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান বলে, লোহা পৃথিবীতে তৈরি হতে পারে না; এটি তৈরি হয় বিশাল

নক্ষত্রের কেন্দ্রে, আর পৃথিবীতে এসেছে উল্কাপাতের মাধ্যমে। এই সত্য কুরআন ইঙ্গিত করেছে চৌদ্দশ বছর আগে।

২. বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা স্তর

সূরা আশ্বিয়া-র ৩২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আর আমি আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ।" বিজ্ঞান বলে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ও উল্কাপিণ্ড থেকে আমাদের রক্ষা করে। ওজোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে, আর বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে বেশিরভাগ উল্কা পুড়ে ছাই হয়।

৩. রাত ও দিনের সুনির্ধারিত সময়

সূরা লোকমান-এর ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তুমি কি দেখ না, আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান?" আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে, পৃথিবী নিজ অক্ষে ঘুরছে বলেই দিন-রাত হয়, আর এই আবর্তনের সময় এত নিখুঁত যে সেকেন্ডের ভগ্নাংশও এদিক-সেদিক হয় না।

৪. প্রাণের উৎস পানি

সূরা আশ্বিয়া-র ৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আর আমি পানি থেকে প্রতিটি জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি।" আধুনিক জীববিজ্ঞান পুরোপুরি স্বীকার করে, পানি ছাড়া জীবন অসম্ভব। মানবদেহের ৬০-৭০% পানি, আর প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল সমুদ্রেই।

৫. নক্ষত্রের স্থান ও শপথ

সূরা ওয়াকিয়া-র ৭৫-৭৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ নক্ষত্রের অবস্থানের শপথ করেছেন এবং বলেছেন এটি এক মহা শপথ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে, আমরা নক্ষত্রের যে আলো দেখি, তা থেকে তার অবস্থান সম্পর্কে আমরা অতীতের তথ্যই পাই; আলোর গতি সীমিত হওয়ায় মহাকাশে নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান নির্ণয় এক জটিল ও বিস্ময়কর ব্যাপার।

৬. অগ্নি ও সবুজ বৃক্ষের সম্পর্ক

সূরা ইয়াসীন-এর ৮০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন তৈরি করেছেন।" বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে, প্রাচীনকালের সবুজ উদ্ভিদ থেকেই আজকের জ্বালানি যেমন কয়লা, গ্যাস ও তেল তৈরি হয়েছে। এটি ফসিল ফুয়েল তত্ত্বের প্রতিধ্বনি।

৭. গুহার বাসিন্দাদের কানের পর্দা

সূরা কাহফ-এর ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ গুহার বাসিন্দাদের (আসহাবে কাহফ) দীর্ঘ ঘুমের কথা বলেছেন এবং ১৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন, "আমি তাদের ডানে-বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম।" আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী রোগীর শরীরে বেডসোর বা ক্ষত রোধে নিয়মিত পার্শ্ব পরিবর্তন জরুরি।

৮. উটের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তার আহ্বান

সূরা গাশিয়া-র ১৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তারা কি উটের দিকে তাকায় না, তা কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?" উট মরুভূমির জন্য এক বিস্ময়কর জীব: এর পানি সংরক্ষণ ক্ষমতা, চোখের অতিরিক্ত পর্দা, পায়ের বিশেষ গঠন এবং কুঁজের চর্বি – সবই আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে।

৯. বিষণ্ণতা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি

সূরা রাদ-এর ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়গুলো প্রশান্তি পায়।" আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞান এখন বলছে, ধ্যান, প্রার্থনা ও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা মানসিক চাপ কমায়। 'মাইন্ডফুলনেস' ও 'মেডিটেশন'-এর যে উপকারিতা আজ বিজ্ঞান স্বীকার করছে, তা যেন 'যিকির'-এরই আধুনিক রূপ।

১০. সাগরে আগুনের আভাস

সূরা তুর-এর ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ 'সাগর যা আগুনে ভরা'র শপথ করেছেন। আধুনিক ভূতত্ত্ব বলে, সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরি ও টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে প্রচণ্ড তাপ ও লাভা থাকে, যা কখনো কখনো পানির নিচে বিস্ফোরিত হয়।

এই সংক্ষিপ্ত নিদর্শনগুলো প্রমাণ করে, কুরআনের কাছে বিজ্ঞানের জগৎ আরও অনেক বিস্তৃত। আমরা অল্প কয়েকটি নিদর্শনই এখানে তুলে ধরতে পেরেছি। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর বাণী অসীম, আর তার নিদর্শনও অগণিত।

সামগ্রিক মূল্যায়ন ও শিক্ষা

এই পুরো থিসিসটি জুড়ে আমরা একটি জিনিস বারবার লক্ষ্য করেছি: কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়, বরং এটি মানবজাতির জন্য পথনির্দেশক গ্রন্থ। কিন্তু এর আয়াতগুলোতে যে বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে, তা বিস্ময়ের উদ্বেক করে। যুগে যুগে যখনই বিজ্ঞান নতুন কোনো সত্য আবিষ্কার করেছে, দেখা গেছে কুরআন সে সত্যের আভাস আগেই দিয়ে রেখেছে। এটি প্রমাণ করে, যে সত্তা এই গ্রন্থ নাজিল করেছেন, তিনিই এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা। কারণ সৃষ্টির রহস্য একমাত্র স্রষ্টাই জানেন।

ড. মরিস বুকাইলি তার "**The Bible, The Qur'an and Science**" বইতে যে গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, তা ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক। দীর্ঘ অধ্যয়নের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, কুরআন কোনো মানুষের রচনা হতে পারে না। এতে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, যা মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে জানা ছিল অসম্ভব। ঠিক একই সুর বেজেছে জনাব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের "বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন" বইতে। বাংলা ভাষায় লেখা এই বইটি আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের কাছে কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিজাগুলোকে অত্যন্ত সহজভাবে পৌঁছে দিয়েছে।

এই দুই গবেষকের কাজ আমাদের শেখায়, ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং প্রকৃত বিজ্ঞানী হতে গেলে কুরআনের দিকে ফিরে তাকানোই বুদ্ধিমানের কাজ। কুরআন মানুষকে চিন্তা করতে, ভাবতে, গবেষণা করতে উৎসাহিত করে। সূরা আলে ইমরানের ১৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ"

অর্থ: "নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দিন-রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"

আল-গালিব সাহেব তার বইতে বলেন, এই আয়াত যেন জ্ঞানীদের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ – এসো, সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করো, তবেই তোমরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও মহিমা বুঝতে পারবে।

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের প্রাসঙ্গিকতা :

আজকের বিশ্ব চরম সংকটে রয়েছে। একদিকে প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি, অন্যদিকে পরিবেশ ধ্বংস, যুদ্ধ, হানাহানি, মানসিক অশান্তি ও নৈতিক অবক্ষয়। এমন সময়ে কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা মানুষের হারানো পথের দিশা দিতে পারে। এটি শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যই দেয় না, বরং দেয় একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। কীভাবে চললে মানুষ শান্তিতে থাকবে, কীভাবে সমাজ গড়লে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, কীভাবে প্রকৃতির সাথে ভারসাম্য রেখে জীবনযাপন করলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব – সব প্রশ্নের উত্তর কুরআনে আছে।

এই থিসিসের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের দেখিয়েছে, কুরআন একদিকে যেমন আধ্যাত্মিকতার চর্চা শেখায়, তেমনি বস্তুগত গবেষণারও উৎসাহ দেয়। কুরআনের নিদর্শনগুলো শুধু মুসলিমদের জন্যই নয়, বরং গোটা মানবজাতির জন্য এক চিন্তার খোরাক। যারা মনে করেন ধর্ম বিজ্ঞানের পথে বাধা, তাদের কাছে এই থিসিস একটি জবাব হতে পারে।

সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ

কুরআনের প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি শব্দের ভেতরে যে বিপুল জ্ঞান লুকিয়ে আছে, তা আলোচনা করতে গেলে হাজার হাজার পৃষ্ঠার দরকার। এখানে আমরা কেবলমাত্র দুজন প্রধান লেখকের ওপর নির্ভর করেছি। ড. বুকাইলি ও আল-গালিব ছাড়াও আরও অনেক

গবেষক আছেন, যেমন ড. জাকির নায়েক, হারুন ইয়াহিয়া, ড. কিথ মুর – যাদের কাজ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

এছাড়া কুরআনের ভাষাগত মু'জিজা, ঐতিহাসিক সত্যতা, ভবিষ্যদ্বাণী – এগুলোও বড় বড় অধ্যায়।

শেষকথা

কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ কি সত্যিই কোনো মানুষের পক্ষে লেখা সম্ভব? যে গ্রন্থে একইসাথে আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, আইন, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের এত নিখুঁত সমন্বয় ঘটেছে, যা কখনো পরস্পরবিরোধী হয়নি, তা কি নিছক কাকতালীয়?

আমরা যখন দেখি, চৌদ্দশ বছর আগের এক গ্রন্থ মহাবিস্ফোরণ থেকে শুরু করে ভ্রূণের স্তর, পাহাড়ের শিকড়, সমুদ্রের বাধা, পানি চক্র, উদ্ভিদের প্রজনন, মৌমাছির জীবন, আঙুলের ছাপ – সবকিছুর এত নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে, তখন আমাদের মন সায় দেয় সেই সত্যের কাছে, যা কুরআন বারবার বলে:

"ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ"

অর্থ: "এটি সেই গ্রন্থ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; এটি মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক।"

এই গ্রন্থ সত্যিই সন্দেহাতীত। আর যারা আল্লাহভীরু, যারা সত্যকে খোঁজেন, তাদের জন্য এটি পথপ্রদর্শক। আমাদের এই থিসিসের একান্ত প্রার্থনা, এটি যেন পাঠকদের হৃদয়ে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়ে দেয়।

সমাপ্ত করতে চাই সূরা ফাতির-এর ২৮ নম্বর আয়াত দিয়ে। আল্লাহ বলেন:

"إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ"

অর্থ: "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানীরাই তাঁকে সত্যিকারভাবে ভয় করে।"

অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান যত গভীর হবে, ততই আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা বাড়ে। আমরা যদি বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে অনুধাবন করি, তবেই বুঝতে পারব এই মহাবিশ্বের এক মহান স্রষ্টা আছেন, যার জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান কিছুই নয়।

পরিশিষ্ট:

এই থিসিসে প্রধানত যে দুটি বই থেকে তথ্য নিয়েছি, সেগুলো হলো:

১. **Bucaille, Maurice. The Bible, The Qur'an and Science.**
(ইংরেজি)

২. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন। (বাংলা)

এছাড়া পাঠকদের আরও অধ্যয়নের জন্য কিছু বই উল্লেখ করা হলো:

· **Naik, Zakir. The Qur'an and Modern Science: Compatible or Incompatible?**

· **Yahya, Harun. Miracles of the Qur'an.**

· **Moore, Keith L. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology** (সহ-লেখক হিসেবে কুরআনের রেফারেন্সসহ)।

· আলী, আব্দুল্লাহ ইউসুফ। **The Holy Qur'an: Translation and Commentary**।

সমাপ্ত